পরিণীতা

==========

প্রথম প্রকাশ

প্রকাশক
প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

গ্রন্থস্বত্ব © প্রকাশক

প্রচ্ছদ
নন্দন
অক্ষর বিন্যাস
বিনতে আফিয়া এন্ড গ্রাফিক্স

বাংলাবাজার , ঢাকা

মুদ্রণ
আমানত প্রিন্টিং

প্রথম পরিচ্ছেদ

শক্তিশেল বুকে পড়িবার সময় লক্ষ্মণের মুখের ভাব নিশ্চয় খুব খারাপ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গুরুচরণের চেহারাটা বোধ করি তার চেয়েও মন্দ দেখাইল—যখন প্রত্যূষেই অন্তঃপুর হইতে সংবাদ পৌঁছিল, গৃহিণী এইমাত্র নির্বিঘ্নে পঞ্চম কন্যার জন্মদান করিয়াছেন।

গুরুচরণ ষাট টাকা বেতনের ব্যাংকের কেরানি। সুতরাং দেহটিও যেমন ঠিকাগাড়ির ঘোড়ার মতো শুষ্ক শীর্ণ, চোখেমুখেও তেমনি তাহাদেরি মতো একটা নিষ্কাম নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাব। তথাপি এই ভয়ংকর শুভ-সংবাদে আজ তাঁহার হাতের হুঁকাটা, হাতেই রহিল, তিনি জীর্ণ পৈতৃক তাকিয়াটা ঠেস দিয়া বসিলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবারও আর তাঁহার জোর রহিল না।

শুভ-সংবাদ বহিয়া আনিয়াছিল তাঁহার তৃতীয় কন্যা দশমবর্ষীয়া আন্নাকালী। সে বলিল, "বাবা, চল না দেখবে।"

গুরুচরণ মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা, এক গেলাস জল আন তো খাই।"

মেয়ে জল আনিতে গেল। সে চলিয়া গেলে, গুরুচরণের সর্বাগ্রে মনে পড়িল সূতিকাগৃহের রকমারি খরচের কথা। তারপরে, ভিড়ের দিনে স্টেশনে গাড়ি আসিলে দোর খোলা পাইলে থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা পোঁটলা-পোঁটলি লইয়া পাগলের মতো যেভাবে লোকজনকে দলিত পিষ্ট করিয়া ঝাঁপাইয়া আসিতে থাকে, তেমনি মার-মার শব্দ করিয়া তাঁহার মগজের

মধ্যে দুশ্চিন্তারাশি হু-হু করিয়া ঢুকিতে লাগিল। মনে পড়িল, গত বৎসর তাঁহার

দ্বিতীয়া কন্যার শুভ-বিবাহে বৌবাজারের এই দ্বিতল ভদ্রাসনটুকু বাঁধা পড়িয়াছে এবং তাহারও ছয় মাসের সুদ বাকি। দুর্গাপূজার আর মাসখানেক মাত্র বিলম্ব আছে—মেজ মেয়ের ওখানে তত্ত্ব পাঠাইতে হইবে। অফিসে কাল রাত্রি আটটা পর্যন্ত ডেবিট ক্রেডিট মিলে নাই, আজ বেলা বারোটার মধ্যে বিলাতে হিসাব পাঠাইতে হইবে। কাল বড়োসাহেব হুকুম জারি করিয়াছেন, ময়লা বস্ত্র পরিয়া কেহ অফিসে ঢুকিতে পারিবে না, ফাইন হইবে, অথচ গত সপ্তাহ হইতে রজকের সন্ধান মিলিতেছে না, সংসারের অর্ধেক কাপড়-চোপড় লইয়া সে বোধ করি নিরুদ্দেশ। গুরুচরণ আর ঠেস দিয়া থাকিতেও পারিলেন না, হুঁকাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া এলাইয়া পড়িলেন। মনে মনে বলিলেন, ভগবান, এই কলিকাতা শহরে প্রতিদিন কত লোক গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়িয়া অপঘাতে মরে, তারা কি আমার চেয়েও তোমার পায়ে বেশি অপরাধী! দয়াময়! তোমার দয়ায় একটা ভারী মোটরগাড়ি যদি বুকের উপর দিয়া চলিয়া যায়!

আন্নাকালী জল আনিয়া বলিল, "বাবা ওঠো, জল এনেচি।"

গুরুচরণ উঠিয়া সমস্তটুকু এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আঃ, যা মা, গেলাসটা নিয়ে যা।"

সে চলিয়া গেলে গুরুচরণ আবার শুইয়া পড়িলেন।

ললিতা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "মামা, চা এনেচি ওঠো।"

চায়ের নামে গুরুচরণ আর একবার উঠিয়া বসিলেন। ললিতার মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার অর্ধেক জ্বালা যেন নিবিয়া গেল, বলিলেন, "সারারাত জেগে আছিস মা, আয় আমার কাছে এসে একবার বোস।"

ললিতা সলজ্জহাস্যে কাছে বসিয়া বলিল, "আমি রাত্তিরে জাগিনি মামা। এই জীর্ণ শীর্ণ গুরুভারগ্রস্ত অকালবৃদ্ধ মাতুলের হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন সুগভীর ব্যথাটা তার চেয়ে বেশি এ সংসারে আর কেহ অনুভব করিত না।"

গুরুচরণ বলিলেন, "তা হোক, আয়, আমার কাছে আয়।" ললিতা কাছে আসিয়া বসিতেই গুরুচরণ তাহার মাথায় হাত দিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আমার এই মাটিকে যদি রাজার ঘরে দিতে পারতুম, তবেই জানতুম একটা কাজ কল্লুম।"

ললিতা মাথা হেঁট করিয়া চা ঢালিতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হাঁ মা, তোর দুঃখী মামার ঘরে এসে দিনরাত্রি খাটতে হয়, না?"

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, "দিবারাত্রি খাটতে হবে কেন মামা? সবাই কাজ করে, আমিও করি।"

এইবার গুরুচরণ হাসিলেন। চা খাইতে খাইতে বলিলেন, "হাঁ ললিতা, আজ তবে রান্নাবান্নার কী হবে মা?"

ললিতা মুখ তুলিয়া বলিল, "কেন মামা, আমি রাঁধব যে!"

গুরুচরণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই রাঁধবি কী মা, রাঁধতে কি তুই জানিস?"

"জানি মামা। আমি মামিমার কাছে সব শিখে নিয়েচি।"

গুরুচরণ চায়ের বাটিটা নামাইয়া ধরিয়া বলিলেন, "সত্যি?"

"সত্যি! মামিমা দেখিয়ে দেন, —আমি কতদিন রাঁধি যে।" বলিয়াই মুখ নিচু করিল।

তাহার আনত মাথার উপর হাত রাখিয়া গুরুচরণ নিঃশব্দে আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার একটা গুরুতর দুর্ভাবনা দূর হইল।

এই ঘরটি গলির উপরেই। চা পান করিতে করিতে জানালার বাহিরে দৃষ্টি পড়ায় গুরুচরণ চেঁচাইয়া ডাকিয়া উঠিলেন, "শেখর না কি? শোন, শোন।" একজন দীর্ঘায়তন বলিষ্ট সুন্দর যুবা ঘরে প্রবেশ করিল।

গুরুচরন বলিলেন, "বসো, আজ সকালে তোমার খুড়িমার কাণ্ডটা শুনেচ বোধ হয়।"

শেখর মৃদু হাসিয়া বলিল, "কাণ্ড আরকি, মেয়ে হয়েছে তাই?"

গুরুচরণ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তুমি তো বলবে তাই, কিন্তু তাই যে কী সে শুধু আমিই জানি যে!"

শেখর কহিল, "ও-রকম বলবেন না কাকা, খুড়িমা শুনলে বড়ো কষ্ট পাবেন। তাছাড়া ভগবান যাকে পাঠিয়েছেন তাকে আদর-আহ্লাদ করে ডেকে নেওয়া উচিত।"

গুরুচরণ মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, "আদর-আহ্লাদ করা উচিত, সে আমিও জানি! কিন্তু বাবা, ভগবানও তো সুবিচার করেন না। আমি গরিব, আমার ঘরে এত কেন? এই বাড়িটুকু পর্যন্ত তোমার বাপের কাছে বাঁধা পড়েছে, তা পড়ুক, সে জন্য দুঃখ করিনে শেখর, কিন্তু এই হাতে-হাতেই দেখো না বাবা, এই যে আমার ললিতা, মা-বাপ মরা সোনার পুতুল, একে শুধু রাজার ঘরেই মানায়।

কী করে একে প্রাণ ধরে যার—তার হাতে তুলে দিই বলো তো? রাজার মুকুটে যে কোহিনুর জ্বলে, তেমনি কোহিনুর

রাশিকৃত করে আমার এই মা-টিকে ওজন করলেও দাম হয় না। কিন্তু কে তা বুঝবে! পয়সার অভাবে এমন রত্নকেও আমাকে বিলিয়ে দিতে হবে। বলো দেখি বাবা, সে-সময়ে কীরকম শেল বুকে বাজবে? তেরো বছর বয়স হলো, কিন্তু হাতে আমার এমন তেরোটা পয়সা নেই যে, একটা সম্বন্ধ পর্যন্ত স্থির করি।"

গুরুচরণের দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। শেখর চুপ করিয়া রহিল। গুরুচরণ পুনরায় কহিলেন, "শেখরনাথ, দেখো তো বাবা, তোমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যদি এই মেয়েটার কোনো গতি করে দিতে পারো। আজকাল অনেক ছেলে শুনেচি টাকাকড়ির দিকে চেয়ে দেখে না, শুধু মেয়ে দেখেই পছন্দ করে। তেমনি যদি দৈবাৎ একটা মিলে যায় শেখর, তাহলে বলচি আমি, আমার আশীর্বাদে তুমি রাজা হবে। আর কী বলব বাবা, এ পাড়ায় তোমাদের আশ্রয়ে আমি আছি, তোমার বাবা আমাকে ছোটো ভায়ের মতোই দেখেন।"

শেখর মাথা নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা তা দেখব।"

গুরুচরণ বলিলেন, "ভুলো না বাবা, দেখো। ললিতা তো আট বছর বয়স থেকে তোমাদের কাছে লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছে, তুমি তো দেখতে পাচ্ছ ও কেমন বুদ্ধিমতী, কেমন শিষ্ট শান্ত। একফোঁটা মেয়ে, আজ থেকে ও-ই আমাদের রাঁধাবাড়া করবে, দেবে-থোবে, সমস্তই এখন ওর মাথায়।"

এই সময়ে ললিতা একটিবার চোখ তুলিয়াই নামাইয়া ফেলিল। তাহার ওষ্ঠাধরের উভয় প্রান্ত ঈষৎ প্রসারিত হইল মাত্র। গুরুচরণ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ওর বাপই কী কিছু কম রোজগার করেচে, কিন্তু সমস্তই এমন করে দান

করে গেল যে, এই একটা মেয়ের জন্যেও কিছু রেখে গেল না।"

শেখর চুপ করিয়া রহিল। গুরুচরণ নিজেই আবার বলিয়া উঠিলেন, "আর রেখে গেল না-ই বা বলি কী করে? সে যত লোকের যত দুঃখ ঘুচিয়েছে, তার সমস্ত ফলটুকুই আমার এই মা-টিকে দিয়ে গেছে, তা নইলে কী এতটুকু মেয়ে এমন অন্নপূর্ণা হতে পারে! তুমিই বলো না শেখর, সত্য কি না?"

শেখর হাসিতে লাগিল। জবাব দিলো না।

সে উঠিবার উপক্রম করিতেই গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, এমন সকালেই কোথা যাচ্ছ?

শেখর বলিল, "ব্যারিস্টারের বাড়ি-একটা কেস আছে।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই গুরুচরণ আর একবার স্মরণ করাইয়া বলিলেন, "কথাটা একটু মনে রেখো বাবা! ও একটু শ্যামবর্ণ বটে, কিন্তু চোখমুখ, এমন হাসি, এত দয়ামায়া পৃথিবী খুঁজে বেড়ালেও কেউ পাবে না।"

শেখর মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল। এই ছেলেটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। এম. এ. পাশ করিয়া এতদিন শিক্ষানবিশি করিতেছিল, গত বৎসর হইতে এটর্নি হইয়াছে। তাহার পিতা নবীন রায় গুড়ের কারবারে লক্ষপতি হইয়া কয়েক বৎসর হইতে ব্যাবসা ছাড়িয়া দিয়া ঘরে বসিয়া তেজারতি করিতেছিলেন, বড়ো ছেলে অবিনাশ উকিল, —ছোটো ছেলে এই শেখরনাথ।

তাঁহার প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি পাড়ার মাথায় উঠিয়াছিল এবং ইহার একটা খোলা ছাদের সহিত গুরুচরণের ছাদটা

মিশিয়া থাকায় উভয় পরিবারে অত্যন্ত আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। বাড়ির মেয়েরা এই পথেই যাতায়াত করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্যামবাজারের এক বড়োলোকের ঘরে বহুদিন হইতেই শেখরের বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছিল। সেদিন তাঁহারা দেখিতে আসিয়া আগামী মাঘের কোনো একটা শুভদিন স্থির করিয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু শেখরের জননী স্বীকার করিলেন না। ঝিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, ছেলে নিজে দেখিয়া পছন্দ করিলে তবে বিবাহ দিব।

নবীন রায়ের চোখ ছিল শুধু টাকার দিকে, তিনি গৃহিণীর এই গোলমেলে কথায় অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "এ আবার কী কথা! মেয়ে তো দেখাই আছে। কথাবার্তা পাকা হয়ে যাক, তারপরে আশীর্বাদ করার দিন ভালো করে দেখলেই হবে।"

তথাপি গৃহিণী সম্মত হইলেন না, পাকা কথা কহিতে দিলেন না। নবীন রায় সেদিন রাগ করিয়া অনেক বেলায় আহার করিলেন এবং দিবানিদ্রাটা বাহিরের ঘরেই দিলেন।

শেখরনাথ লোকটা কিছু শৌখিন। সে তেতলায় যে ঘরটিতে থাকে, সেটি অতিশয় সুসজ্জিত। দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন অপরাহ্ণবেলায় সে সেই ঘরের বড়ো আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মেয়ে দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল,

ললিতা ঘরে ঢুকিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বৌ দেখতে যাবে, না?"

শেখর ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "এই যে! কই বেশ করে সাজিয়ে দাও দেখি, বৌ যাতে পছন্দ করে।"

ললিতা হাসিল। বলিল, "এখন তো আমার সময় নেই শেখরদা-আমি টাকা নিতে এসেচি," বলিয়া বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া একটা দেরাজ খুলিয়া গণিয়া গণিয়া গুটি-কয়েক টাকা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া যেন কতকটা নিজের মনেই বলিল, "টাকা তো দরকার হলেই নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এ শোধ হবে কী করে?"

শেখর চুলের একপাশ বুরুশ দিয়া সযত্নে উপরের দিকে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "শোধ হবে, না হচ্ছে!"

ললিতা বুঝিতে পারিল না, চাহিয়া রহিল।

শেখর বলিল, "চেয়ে রইলে, বুঝতে পারলে না?"

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না।"

"আরও একটু বড়ো হও, তখন বুঝতে পারবে," বলিয়া শেখর জুতা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে শেখর একটা কোচের উপর চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, মা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। মা একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "মেয়ে কীরকম দেখে এলি রে?"

শেখর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "বেশ।"

শেখরের মায়ের নাম ভুবনেশ্বরী। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু এমনি সুন্দর তাঁহার দেহের বাঁধন যে দেখিলে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের অধিক মনে হইতো না। আবার এই সুন্দর আবরণের মধ্যে যে মাতৃহৃদয়টি ছিল, তাহা আরও নবীন আরও কোমল। তিনি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে; পাড়াগাঁয়ে জন্মিয়া সেইখানেই বড়ো হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শহরের মধ্যে তাঁহাকে একদিনের জন্য বেমানান দেখায় নাই। শহরের চাঞ্চল্যসজীবতা এবং আচার-ব্যবহারও যেমন তিনি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, জন্মভূমির নিবিড় নিস্তব্ধতা ও মাধুর্যও তেমনি হারাইয়া ফেলেন নাই।

এই মাটি যে শেখরের কত বড়ো গর্বের বস্তু ছিল, সে-কথা তাহার মা-ও জানিতেন না। জগদীশ্বর শেখরকে অনেক বস্তু দিয়াছিলেন। অনন্যসাধারণ স্বাস্থ্য, রূপ, ঐশ্বর্য, বুদ্ধি—কিন্তু এই জননীর সন্তান হইতে পারার ভাগ্যটাকেই সে কায়মনে ভগবানের সবচেয়ে বড়ো দান বলিয়া মনে করিত। মা বলিলেন, " 'বেশ' বলে চুপ করে রইলি যে রে!"

শেখর আবার হাসিয়া মুখ নিচু করিয়া বলিল, "যা জিজ্ঞেস করলে তাই তো বললুম।"

মা-ও হাসিলেন। বলিলেন, "কই বললি? রং কেমন, ফরসা? কার মতো হবে? আমাদের ললিতার মতো?"

শেখর মুখ তুলিয়া বলিল, "ললিতা তো কালো মা, ওর চেয়ে ফরসা।"

"মুখচোখ কেমন?"

"তাও মন্দ নয়।"

"তবে কর্তাকে বলি?"

এবার শেখর চুপ করিয়া রহিল।

মা ক্ষণকাল পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "হাঁ রে, মেয়েটি লেখাপড়া শিখেচে কেমন?"

শেখর বলিল, "সে তো জিজ্ঞাসা করিনি মা!"

অতিশয় আশ্চর্য হইয়া মা বলিলেন, "জিজ্ঞেস করিসনি কিরে! যেটা আজকাল তোদের সবচেয়ে দরকারি জিনিস, সেইটেই জেনে আসিসনি?"

শেখর হাসিয়া বলিল, "না মা, ও-কথা আমার মনেই ছিল না।"

ছেলের কথা শুনিয়া এবার তিনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তবে তুই ওখানে বিয়ে করবি নে দেখচি!"

শেখর কী একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এই সময় ললিতাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল। ললিতা ধীরে ধীরে ভুবনেশ্বরীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি বাঁ হাত দিয়া তাহাকে সুমুখের দিকে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "কী মা?"

ললিতা চুপি চুপি বলিল, "কিচ্ছু না মা।"

ললিতা পূর্বে ইঁহাকে মাসিমা বলিত, কিন্তু তিনি নিষেধ করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোর আমি তো মাসি হইনে ললিতে, মা হই।' তখন হইতে সে মা বলিয়া ডাকিত। ভুবনেশ্বরী তাহাকে বুকের আরও কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিয়া বলিলেন, "কিচ্ছু না? তবে বুঝি আমাকে শুধু একবার দেখতে এসেছিস?"

ললিতা চুপ করিয়া রহিল।

শেখর কহিল, "দেখতে এসেছে, রাঁধবে কখন?"

মা বলিলেন, "রাঁধবে কেন?"

শেখর আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে তবে ওদের রাঁধবে মা? ওর মামাও তো সেদিন বললেন, ললিতাই রাঁধাবাড়া সব কাজ করবে।"

মা হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ওর মামার কী, যাহোক, একটা বললেই হলো। ওর বিয়ে হয়নি, ওর হাতে খাবে কে? আমাদের বামুনঠাকরুনকে পাঠিয়ে দিয়েচি, তিনি রাঁধবেন। বড়োবৌমা আমাদের রান্নাবান্না করচেন—আমি দুপুরবেলা ওদের বাড়িতেই আজকাল খাই।"

শেখর বুঝিল, মা এই দুঃখী পরিবারের গুরুভার হাতে তুলিয়া লইয়াছেন।

সে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

মাসখানেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর শেখর নিজের ঘরে কোচের উপর কাত হইয়া একখানি ইংরাজি নভেল

পড়িতেছিল। বেশ মন লাগিয়া গিয়াছিল, এমন সময় ললিতা ঘরে ঢুকিয়া বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া শব্দ-সাড়া করিয়া দেরাজ খুলিতে লাগিল। শেখর বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "কী?"

ললিতা বলিল, "টাকা নিচ্চি।"

"হুঁ," বলিয়া শেখর পড়িতে লাগিল। ললিতা আঁচলে টাকা বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ সে সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়াছিল, তাহার ইচ্ছা শেখর চাহিয়া দেখে। কহিল, "দশ টাকা নিলুম শেখরদা।"

শেখর 'আচ্ছা' বলিল, কিন্তু চাহিয়া দেখিল না। অগত্যা সে এটা-ওটা নাড়িতে লাগিল, মিছামিছি দেরি করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হইল না, তখন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু গেলেই তো চলে না, আবার তাহাকে ফিরিয়া আসিয়া দোরগোড়ায় দাঁড়াইতে হইল। আজ তাহারা থিয়েটার দেখিতে যাইবে।

শেখরের বিনা হুকুমে সে যে কোথাও যাইতে পারে না, ইহা সে জানিত। কেহই তাহাকে ইহা বলিয়া দেয় নাই, কিংবা কেন, কী জন্য, এসব তর্কও কোনোদিন মনে উঠে নাই। কিন্তু জীবমাত্রেরই যে একটা স্বাভাবিক সহজবুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধিই তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিল; অপরে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যেখানে খুশি যাইতে পারে, কিন্তু সে পারে না। সে স্বাধীনও নয় এবং মামা-মামির অনুমতিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সে

দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, "আমরা যে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি।"

তাহার মৃদুকণ্ঠ শেখরের কানে গেল না-সে জবাব দিলো না।

ললিতা তখন আরও একটু গলা চড়াইয়া বলিল, "সবাই আমার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েচে যে।"

এবার শেখর শুনিতে পাইল, বইখানা একপাশে নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী হয়েছে?"

ললিতা একটুখানি রুষ্টভাবে বলিল, "এতক্ষণে বুঝি কানে গেল। আমরা থিয়েটারে যাচ্ছি যে।"

শেখর বলিল, "আমরা কারা?"

"আমি, আন্নাকালী, চারুবালা, তার মামা।"

"মামাটি কে?"

ললিতা বলিল, "তাঁর নাম গিরীনবাবু। পাঁচ-ছ'দিন হলো মুঙ্গেরের বাড়ি থেকে এসেচেন, এখানে বি.এ. পড়বেন—বেশ লোক সে—"

"বাঃ—নাম, ধাম, পেশা—এ যে দিব্যি আলাপ হয়ে গেছে দেখচি। তাতেই চার-পাঁচ দিন মাথার টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাইনি—তাস খেলা হচ্ছিল বোধ করি?"

হঠাৎ শেখরের কথা বলার ধরন দেখিয়া ললিতা ভয় পাইয়া গেল। সে মনেও করে নাই, এরূপ একটা প্রশ্নও

উঠিতে পারে। সে চুপ করিয়া রহিল। শেখর বলিল, "এ ক'দিন খুব তাস চলছিল, না?"

ললিতা ঢোক গিলিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "চারু বললে যে।"

"চারু বললে? কী বললে?" বলিয়া শেখর মাথা তুলিয়া একবার চাহিয়া দেখিয়া কহিল, "একেবারে কাপড় পরে তৈরি হয়ে আসা হয়েছে, আচ্ছা যাও।"

সে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

পাশের বাড়ির চারুবালা তাহার সমবয়সি এবং সই। তাহারা ব্রাহ্ম। শেখর ওই গিরীনকে ছাড়া তাহাদের সকলকেই চিনিত। গিরীন পাঁচ-সাত বৎসর পূর্বে কিছুদিনের জন্য একবার এদিকে আসিয়াছিল। এতদিন বাঁকিপুরে পড়িত, কলিকাতায় আসিবার প্রয়োজনও হয় নাই, আসেও নাই। তাই শেখর তাহাকে চিনিত না। ললিতা তথাপি দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বলিল, "মিছে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও। বলিয়া মুখের সমুখেই বই তুলিয়া লইল।"

মিনিট-পাঁচেক চুপ করিয়া থাকার পরে ললিতা আবার আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "যাব?"

"যেতেই তো বললুম, ললিতা।"

শেখরের ভাব দেখিয়া ললিতার থিয়েটার দেখিবার সাধ লোপ পাইল, কিন্তু তাহার না গেলেও যে নয়।

কথা হইয়াছিল, সে অর্ধেক খরচ দিবে এবং চারুর মামা অর্ধেক দিবে। চারুদের ওখানে সকলেই তাহার জন্য অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতেছে এবং যত বিলম্ব হইতেছে তাহাদের

অধৈর্যও তত বাড়িতেছে, ইহা সে চোখের উপর দেখিতে লাগিল, কিন্তু উপায়ও খুঁজিয়া পাইল না। অনুমতি না পাইয়া যাইবে এত সাহস তাহার ছিল না। আবার মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, "শুধু আজকের দিনটি—যাব?"

শেখর বইটা একপাশে ফেলিয়া দিয়া ধমকাইয়া উঠিল, "বিরক্ত করো না ললিতা, যেতে ইচ্ছে হয় যাও, ভালো-মন্দ বোঝবার তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে।"

ললিতা চমকিয়া উঠিল। শেখরের কাছে বকুনি খাওয়া তাহার নূতন নহে; অভ্যাস ছিল বটে, কিন্তু দু-তিন বৎসরের মধ্যে এরকম শুনে নাই। ওদিকে বন্ধুরা অপেক্ষা করিয়া আছে, সে-ও কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, ইতোমধ্যে টাকা আনিতে আসিয়া এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। এখন তাহাদের কাছেই বা সে কী বলিবে?

কোথাও যাওয়া-আসা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত তাহার শেখরের তরফ হইতে অবাধ স্বাধীনতা ছিল, সেই জোরেই সে একেবারে কাপড় পরিয়া সাজিয়া আসিয়াছিল, এখন শুধু যে সেই স্বাধীনতাই এমন রূঢ়ভাবে খর্ব হইয়া গেল তাহা নহে, যে-জন্য হইল সে কারণটা যে কতবড়ো লজ্জার, তাহাই আজ তাহার তেরো বছর বয়সে প্রথম উপলব্ধি করিয়া সে মরমে মরিয়া যাইতে লাগিল। অভিমানে চোখ অশ্রুপূর্ণ করিয়া সে আরও মিনিট-পাঁচেক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। নিজের ঘরে গিয়া ঝিকে দিয়া আন্নাকালীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার হাতে দশটা টাকা দিয়া

কহিল, "তোরা আজ যা কালী, আমার বড়ো অসুখ কচ্চে, সইকে বল গে আমি যেতে পারব না।"

কালী জিজ্ঞাসা করিল, "কী অসুখ সেজদি?"

"মাথা ধরেছে, গা বমি-বমি কচ্চে—ভারী অসুখ কচ্চে," বলিয়া সে বিছানায় পাশ ফিরিয়া শুইল। তারপর চারু আসিয়া সাধাসাধি করিল, পীড়াপীড়ি করিল, মামিকে দিয়া সুপারিশ করাইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাজি করিতে পারিল না। আন্নাকালী হাতে দশটা টাকা পাইয়া যাইবার জন্য ছটফট করিতেছিল। পাছে এইসব হাঙ্গামায় পড়িয়া যাওয়া না ঘটে, এই ভয়ে সে চারুকে আড়ালে ডাকিয়া টাকা দেখাইয়া বলিল, "সেজদির অসুখ কচ্চে—সে নাই গেল চারুদি! আমাকে টাকা দিয়েছে, এই দ্যাখো—আমরা যাই চল।" চারু বুঝিল, আন্নাকালী বয়সে ছোটো হইলেও বুদ্ধিতে কাহারও খাটো নয়। সে সম্মত হইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারুবালার মা মনোরমার তাস খেলার চেয়ে প্রিয় বস্তু সংসারে আর কিছুই ছিল না। কিন্তু খেলার ঝোঁক যতটা ছিল দক্ষতা ততটা ছিল না। তাঁহার এই ত্রুটি শুধরাইয়া যাইত ললিতাকে পাইলে। সে খুব ভালো খেলিতে পারিত। মনোরমার মামাতো ভাই গিরীন্দ্র আসা পর্যন্ত এ-কয়দিন সমস্ত দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে তাসের বিরাট আড্ডা বসিতেছিল। গিরীন পুরুষ মানুষ, খেলে ভালো, সুতরাং তার বিপক্ষে বসিতে গেলে মনোরমার ললিতাকে চাই-ই।

থিয়েটার দেখার পরের দিন যথাসময়ে ললিতা উপস্থিত হইল না দেখিয়া মনোরমা ঝিকে পাঠাইয়া দিলেন। ললিতা তখন একটি মোটা খাতায় একখানা ইংরাজি বই হইতে বাংলা তর্জমা করিতেছিল, গেল না।

তাহার সই আসিয়াও কিছু করিতে পারিল না, তখন মনোরমা নিজে আসিয়া তাহার খাতাপত্র একদিকে টান মারিয়া সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "নে, ওঠ। বড়ো হয়ে তোকে জজিয়তি করতে হবে না, বরং তাস খেলতেই হবে—চল।"

ললিতা মনে মনে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া, কাঁদ-কাঁদ হইয়া জানাইল, আজ তাহার কিছুতেই যাবার জো নাই, বরং কাল যাইবে। মনোরমা কিছুতেই শুনিলেন না, অবশেষে মামিকে জানাইয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন; সুতরাং তাহাকে আজও গিয়া গিরীনের বিপক্ষে বসিয়া তাস খেলিতে হইল। কিন্তু, খেলা জমিল না। এদিকে সে এতটুকু মন দিতে পারিল না। সমস্ত সময়টা আড় হইয়া রহিল এবং বেলা না পড়িতেই উঠিয়া পড়িল। যাইবার সময় গিরীন বলিল, "রাত্রে আপনি টাকা পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু গেলেন না, কাল আবার যাই চলুন।"

ললিতা মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "না, আমার বড়ো অসুখ করেছিল।"

গিরীন হাসিয়া বলিল, "এখন তো অসুখ সেরেচে, চলুন কাল যেতে হবে।"

"না না, কাল আমার সময় হবে না," বলিয়া ললিতা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আজ শধু যে শেখরের ভয়ে তাহার খেলায় মন লাগে নাই তাহা নহে, তাহার নিজেরও ভারী লজ্জা করিতেছিল।

শেখরের বাটির মতো, এই বাটিতেও সে ছেলেবেলা হইতে আসা-যাওয়া করিয়াছে এবং ঘরের লোকের মতোই সকলের সুমুখে বাহির হইয়াছে। তাই চারুর মামার সুমুখেও